XXCE

বন্দে মাতরম্

আনন্দবাজার পত্রিকা

৯৪ বর্ষ ২৪৪ সংখ্যা মঙ্গলবার ২৩ কার্তিক ১৪২২ কলকাতা

সংখ্যা ব্রহ্ম

বিহারে নরেন্দ্র মোদীর সাফল্য-ব্যর্থতার খতিয়ান দেখিতে বসিয়া আসনসংখ্যার বিচার করিলে প্রকৃত ছবিটি চোখ এড়াইয়া যাইবে। আসনসংখ্যার নিরিখে বিজেপির ভরাডুবি হইয়াছে। কিন্তু, তাহা নিছক বহিরঙ্গের হিসাব। প্রকৃত ছবিটি রহিয়াছে সংখ্যাসমুদ্রের গভীরে। এই নির্বাচনে একক দল হিসাবে সর্বাধিক ভোট পাইয়াছে বিজেপি-ই— ২৪.৪ শতাংশ। নির্বাচনে বিজয়ী রাষ্ট্রীয় জনতা দল ও সংযুক্ত জনতা দলের ভোটপ্রাপ্তির পরিমাণ যথাক্রমে ১৮.৪ ও ১৬.৮ শতাংশ। ২০১০ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সহিত তুলনা করিলে ছবিটি আরও স্পষ্ট হইবে। সেই বৎসর নীতীশ কুমারের সংযুক্ত জনতা দলের সহিত জোট বাঁধিয়া বিজেপি প্রায় সাড়ে ষোলো শতাংশ ভোট পাইয়াছিল। অর্থাৎ, পাঁচ বৎসরে ভোট বাড়িয়াছে প্রায় আট শতাংশ-বিন্দু। পাটিগণিতের এই হিসাবের গভীরে রহিয়াছে আরও একটি সত্য। জোটের ধর্মই হইল, যে দল যেখানে অপেক্ষাকৃত ভাবে শক্তিশালী, সেখানে সেই দল প্রার্থী দেয়। অর্থাৎ, ২০১০ সালে বিজেপির সাড়ে ষোলো শতাংশ ভোট আসিয়াছিল নিজেদের দুর্গ হইতে। এই দফায় বিজেপি-ই এনডিএ-র বড় শরিক ছিল। পাসওয়ান, মাঁঝি, কুশওয়াহাদের জায়গা ছাড়িয়া তাহাদের অবশিষ্ট বিহারে লড়িতে হইয়াছিল। সেই হিসাবে এই আট শতাংশ বিন্দুর উন্নতি আরও তাৎপর্যপূর্ণ। সত্য, ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের তুলনায় বিজেপি-র ভোট কমিয়াছে। কিন্তু, স্মরণে রাখা প্রয়োজন, লোকসভা আর বিধানসভা নির্বাচন এক খেলা নহে। বিশেষত, গত লোকসভা নির্বাচনটি নরেন্দ্র মোদীর কল্যাণে প্রায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের রূপ লইয়াছিল। তাহার পরেও যে বিজেপি মাত্র পাঁচ শতাংশ-বিন্দু ভোট হারাইয়াছে, তাহাই প্রণিধানযোগ্য। অর্থাৎ, সংখ্যা বলিতেছে, বিহারে বিজেপি-র প্রতিষ্ঠা এখন প্রশ্নাতীত।

এই প্রতিষ্ঠাই বাস্তব— দীর্ঘমেয়াদি বাস্তব। এই বাস্তবটি অবশ্য আসনসংখ্যার কুয়াশায় ঢাকা পড়িয়া আছে। কিন্তু, প্রকৃত রাজনীতির হিসাব কুয়াশা সরাইয়া বাস্তবের ছবিটি দেখিতে চাহিবে। তাহার জন্যই সংখ্যা নামক ব্রহ্মের উপাসনা প্রয়োজন। কাজটি বিলক্ষণ কঠিন। ব্রহ্মের আরাধনা সকলের আয়ত্ত হয় না। ফলে, আসনসংখ্যার হিসাবটিই আলোচ্য হইয়া দাঁড়ায়, সেই নিরিখেই সাফল্য-ব্যর্থতার বিচার হয়। কিন্তু, রাজ্যের প্রতি চার জন ভোটারের এক জনের বিজেপি-র প্রতি নিষ্ঠা একেবারে অচলা, তাহা আসনসংখ্যার হিসাব দেখিয়া বলা চলে না। অন্য দিকে, বিজেপির সেই তন্নিষ্ঠ ভোট অতিমাত্রায় অঞ্চল-ভিত্তিক, রাজ্যব্যাপী নহে। ভবিষ্যতের রাজনীতির ক্ষেত্রে এই হিসাবই তাৎপর্যপূর্ণ, আসনসংখ্যা নহে। কিন্তু, তাহার জন্য সংখ্যা সমুদ্রের গভীরে নামিবার সাহস প্রয়োজন।

এবং, বুঝিতে হইবে, কী ভাবে সংখ্যা নির্মিত হয়। ভোট ভাগের হিসাব দেখাইতেছে, বিজেপি-র জোটসঙ্গীরা ভোট টানিতে ব্যর্থ। কিন্তু, সেই ব্যর্থতার স্বরূপ কী? রামবিলাস পাসওয়ানের লোক জনশক্তি পার্টি গত নির্বাচনে ৬.৭৫ শতাংশ ভোট পাইয়াছিল, এই দফায় ৪.৮ শতাংশ। বিহারের মোট জনসংখ্যায় এই দলের মূল সমর্থকভিত্তি দুসাধদের অনুপাত পাঁচ শতাংশ। অর্থাৎ, পাসওয়ান তাঁহার মূল সমর্থকভিত্তির ভোটও টানিতে পারেন নাই। জিতনরাম মাঁঝি ও উপেন্দ্র কুশওয়াহার ক্ষেত্রেও ছবিটি অভিন্ন। অন্য দিকে, নীতীশ কুমার তাঁহার জাতিগত ভোটব্যাঙ্ক কুর্মির হাতে থাকা মোট ভোটের বহু গুণ টানিতে সক্ষম হইয়াছেন। অর্থাৎ, সংখ্যা কোনও স্থাবর, অচল অঙ্ক নহে— তাহা জঙ্গম ও ক্রমনির্মাণশীল। জাতিগত পরিচিতির সহিত উন্নয়নের মিশেলেই সংখ্যা নির্মিত হয়। আসনসংখ্যার হিসাব হইতে এই ছবি খুঁজিয়া পাওয়া অসম্ভব। তাহার জন্য সংখ্যা ব্রহ্মের সাধনা নির্বিকল্প।

রোগীর মহিমা

রসায়ন আছে, পাটিগণিতও আছে

মইদুল ইসলাম

পাটিগণিত বলছে যে, সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই হল এক দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প। সেই দীর্ঘমেয়াদি জোট বিহারে কত দিন থাকবে, আর দেশের অন্যান্য প্রদেশেও সে রকম কোনও জোট হবে কি না, সেটা দেখার বিষয়।

ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করার রাজনীতি যে ভারতের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ঠিক করতে পারে না, বিহারের নির্বাচনী ফল সেটা বুঝিয়ে দিল। দিল্লি বিধানসভার মতো বিহারেও নরেন্দ্র মোদী-অমিত শাহ জুটি রাজনৈতিক প্রচারের প্রধান মুখ ছিলেন। তাই এক বছরের মধ্যে দুটো বড় নির্বাচনী বিপর্যয়ের দায় তাঁদের উপরে তো কিছুটা পড়া উচিত।

২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদীর মতো এক দোর্দণ্ডপ্রতাপ ও কর্তৃত্ববাদী নেতার প্রচারিত মোদীত্ব ছিল ১৯৯০-এর দশকের ব্রাহ্মণ-বানিয়া জোটের হিন্দু জাতীয়তাবাদের থেকে গুণগত ভাবে ভিন্ন একটি ধারার হিন্দুত্ববাদী জনমোহিনী রাজনীতি, যা বৃহৎ কর্পোরেট পুঁজির পূর্ণ সমর্থনের সঙ্গে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ, জাতপাতের রাজনীতি ও 'আচ্ছে দিন মার্কা' ফাঁকা বুলি আওড়ানো একটা ফাঁপা উন্নয়নের ঢাক পেটানো মডেল, যার জন্য সাধারণ মানুষের সমর্থন জোগাতে প্রধান কান্ডারি নিজেকে কখনও গরিব 'চাওয়ালা' বলেছেন, কখনও বা অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির মানুষ (ওবিসি) বলে পরিচয় দিয়েছেন। একই সঙ্গে ধনী ও গরিব মানুষের স্বার্থ রক্ষার কথা বলা এই রাজনীতির সঙ্কট আজ পরিস্ফুট। দিল্লির বিধানসভা নির্বাচনে গোহারান হারার পর বিহারের বিধানসভা নির্বাচনে আর এক বার প্রমাণ হল, মোদীত্ব এখন মধ্য-বাম সামাজিক-আর্থিক নীতির দ্বারা চালিত কিছু আঞ্চলিক দলের জনমোহিনী রাজনীতির কাছে পরাস্ত হচ্ছে।

নীতীশ কুমার সরকারের গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন উপঢৌকন বিতরণের রাজনীতি মহিলাদের মধ্যে বিহার সরকারের জনপ্রিয়তা বাড়িয়েছে। অন্য দিকে, নরেন্দ্র মোদী গত লোকসভা নির্বাচনে তাঁর দেওয়া গগনচুম্বী অঙ্গীকারগুলো রক্ষা করতে ব্যর্থ হওয়ার ফলে গরিব মানুষ নিজেদের প্রতারিত মনে করেছেন। নির্বাচনী প্রচারে মোদী-শাহ জুটির বিরুদ্ধে 'বিহারি' বনাম 'বাহারি'-র মোক্ষম বাগ্মিতা লক্ষ করা গিয়েছিল লালুপ্রসাদ ও নীতীশ কুমারের প্রচারে। লালু-নীতীশ জুটি সুকৌশলে জনগণকে বোঝালেন যে বিহার রাজ্য কোনও 'বাহারি' (মোদী-শাহের মতো রাজ্যের বাইরে থেকে আসা এবং 'অসার বাগাড়ম্বরপূর্ণ' নেতারা) চালাবেন না। অন্য দিকে, বিহারি স্বাভিমানের কথা বলে ও সামাজিক ন্যায়ের মণ্ডল রাজনীতিকে সামনে রেখে কমণ্ডলুর রাজনীতিকে তাঁরা হারালেন। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্মবিযুক্ত বক্তব্য না রেখে কোনও মতে মিনমিন করা প্রতিবাদ খুব একটা কাজে দেয় না। বিহারের নির্বাচন আর এক বার প্রমাণ করল, সাম্প্রদায়িক ও ঘৃণামূলক প্রচারের বিরুদ্ধে পাল্টা আগ্রাসী কিন্তু বুদ্ধিমান রাজনৈতিক প্রচার অনেক ফলপ্রসূ।

২০১১ সালের জনসুমারির জাতপাতের সম্পূর্ণ হিসেব এখনও প্রকাশিত না হলেও এই গণনার ভিত্তিতে বিহারের জাতিগত বিন্যাস নিয়ে কয়েকটা প্রতিবেদন বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে ছাপা হয়েছে। সেই হিসেব অনুযায়ী বিহারে ৫১ শতাংশ মানুষ ওবিসি-ভুক্ত, যার মধ্যে ১৪% যাদব, ৪% কুর্মি, ৬% কুশবহা, ৮% কোয়েরি এবং ৩.২% তেলি। আবার, এই রাজ্যে ১৭% মানুষ মুসলিম, ১৬% দলিত, ১.৩% আদিবাসী এবং ০.৪% অন্যান্য সংখ্যালঘু (খ্রিস্টান, শিখ ও জৈন) সম্প্রদায়ের। অন্য দিকে, ১৫% উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের মধ্যে ৩% ভূমিহার, ৫% ব্রাহ্মণ, ৬% রাজপুত ও ১% কায়স্থ। বিহারে উচ্চ বর্ণ ও নিম্ন বর্ণের জাতপাতের রাজনীতির বরাবর একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। কিন্তু গত আড়াই দশকে জাতপাতের রাজনীতিতে কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। ২০১০ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জেডিইউ-এর সমর্থনে বিজেপি ১০২ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৯১ আসন জেতে এবং ১৬.৪৯% ভোট

জয়ী। ফল ঘোষণার পরে নীতীশ কুমার। পটনা, ৮ নভেম্বর। *পিটিআই*

পায়। ২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে জেডিইউ-র সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়েও বিজেপি ১২২টি বিধানসভা আসনে এগিয়ে থাকে, ভোট বেড়ে হয় ২৯.৮৬%। এই অতিরিক্ত ভোট কেবলমাত্র বেশি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে হয়নি। গত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির ওই উত্থানের পিছনে, উচ্চ বর্ণের ভোটকে আরও বেশি সংহত করা এবং ওবিসি'র মধ্যে সব থেকে পিছিয়ে পড়া অংশকে আকর্ষণ করার নির্ণায়ক ভূমিকা ছিল। ২০১৫'র নির্বাচনে বিজেপি ১৫৭টি বিধানসভায় লড়ে মাত্র ৫৩ আসন পেয়েছে এবং ঝুলিতে পড়েছে ২৪.৪% ভোট। অর্থাৎ গত বছরের লোকসভা নির্বাচনের সময় থেকে বিজেপি প্রায় ৫.৫ শতাংশ-বিন্দু ভোট খুইয়েছে।

গত লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনের প্রাথমিক হিসেব থেকে এটা পরিষ্কার যে, বিহার রাজনীতির যেমন রসায়ন আছে, তেমন পাটিগণিত আছে। সেই পাটিগণিত বলছে যে ভবিষ্যতে বিজেপিকে রুখতে গেলে গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিকে অতীতের কলহ ভুলে গিয়ে কেবল সাময়িক নির্বাচনী জোট করলেই হবে না। সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই হল এক দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প। সেই দীর্ঘমেয়াদি জোট বিহারে কত দিন থাকবে, আর দেশের অন্যান্য প্রদেশেও সে রকম কোনও জোট হবে কি না, সেটা দেখার বিষয়। ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক শক্তি স্লোগান দিতেই পারে, 'অভি ইয়ে আঙরাই হ্যায়, আগে লড়াই বাকি হ্যায়' ('এখন কেবল আড়মোড় ভাঙা, সামনে লড়াই বাকি আছে')।

দিল্লির সেন্টার ফর স্টাডি অব ডেভেলপিং সোসাইটিজ (সিএসডিএস) দীর্ঘ দিন ধরে বিশদ নির্বাচনোত্তর সমীক্ষা চালিয়ে আসছে। তাদের শেষ কয়েকটা সমীক্ষা থেকে পরিষ্কার যে, বিহারে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির অংশ, যাদব গোষ্ঠীর মধ্যে লালুপ্রসাদের আরজেডি-র সামাজিক ভিত্তি আছে। উল্টো দিকে, নীতীশ কুমারের নেতৃত্বাধীন জেডিইউ অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির অংশ কুর্মি ও কোয়েরি গোষ্ঠীর মধ্যে জনপ্রিয়। এহেন অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণিভিত্তিক দলগুলোর সঙ্গে কংগ্রেস থাকলে মুসলিম ভোট আরও সুসংহত হয়। বিহারে বিজেপির মতো মূলত একটা উচ্চ বর্ণের দলের সঙ্গে পোড়খাওয়া রামবিলাস পাসোয়ানের লোকজনশক্তি পার্টির পিছনে থাকা দলিত ভোট এবং রাজনীতির ময়দানে নবাগত দুটো দল, উপেন্দ্র কুশবহার রাষ্ট্রীয় লোক সমতা পার্টির পিছনে থাকা অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির অন্তর্গত কুশবহা গোষ্ঠী ও জিতনরাম মাঁঝি-র হিন্দুস্তানি আওয়াম মোর্চা-র সমর্থনে দলিত সম্প্রদায়ের অন্তর্গত মুশহর জাতির রাজনৈতিক-সামাজিক সমঝোতা হয়েছিল। সেই জোটের বিরুদ্ধেই শক্তিশালী অনগ্রসর শ্রেণি ও মুসলিমদের একটা রাজনৈতিক-সামাজিক জোটের প্রতিফলন হল জেডিইউ-আরজেডি-কংগ্রেসের মহাজোট। এই মহাজোট ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে দেখা যায়নি। ফলে বিজেপি-বিরোধী ভোট ভাগাভাগি, কেন্দ্রের শাসক জোটকে সাহায্য করেছিল। কিন্তু লোকসভা নির্বাচনের তিন মাস পরে বিহারে যে দশটি বিধানসভা উপনির্বাচন হয়, তাতে মহাজোট ছ'টা আসন জিতেছিল আর সপ্তম আসনটি মাত্র সাতশোর কিছু বেশি ভোটে হেরেছিল এনডিএ জোটের কাছে।

এত দিন নরেন্দ্রদেবের হয়ে গলা ফাটানো এক অর্থনীতিবিদ বলতে বাধ্য হলেন, 'গরু দুধ দেয়, ভোট দেয় না'। বিজেপি নেতা, কর্মী ও সমর্থকরা কি শুনছেন?

বিহার নির্বাচনের প্রাক্কালে আরএসএস প্রধান মোহন ভগবত ভারতের সংবিধানে প্রদত্ত ও সরকার কর্তৃক সম্প্রসারিত সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থাকে পুনর্বিবেচনার কথা বলার ফলে বিজেপি-র উপর দলিত ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ খেপে যায়। বিজেপি শাসিত হরিয়ানায় দলিত শিশুদের হত্যা এবং সেই প্রসঙ্গে গণমাধ্যমে সরকারের নিন্দা হওয়ার অনতিবিলম্ব পরে এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দলিতদের সম্পর্কে অসংবেদনশীল মন্তব্য, বিহারে এনডিএ জোটকে দলিতদের থেকে আরও বিচ্ছিন্ন করে। বিজেপির সর্বোচ্চ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে প্রাক্তন মন্ত্রী, অরুন শৌরি ও শত্রুঘ্ন সিন্‌হার যুগলবন্দির তির্যক সমালোচনামূলক বিবৃতি সেমসাইড গোল করতেও ছাড়েনি। তার উপর নির্বাচন চলাকালীন মহারাষ্ট্র ও বিহারে বিজেপি-শিবসেনা দ্বৈরথ এনডিএ-র অন্তর্নিহিত কলহকে উন্মোচিত করতে সাহায্য করেছে।

১৯৯০ সালে বিহারের জনতা হিন্দুত্ববাদের রথ যাত্রা রুখেছিলেন। পঁচিশ বছর পর আবার তাঁরা হিন্দু জাতীয়তাবাদের বিজয়রথ রুখলেন। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির বিপুল জয় হয়েছিল প্রধানত উত্তর ও পশ্চিম ভারতের রাজ্যগুলোতে অভূতপূর্ব সাফল্যের সুবাদে। একই সঙ্গে উত্তর ও পশ্চিম ভারতে কংগ্রেস ও সেই সব প্রদেশের বিজেপি-বিরোধী আঞ্চলিক দলগুলোর সরকার চালানোর ব্যর্থতা ও কিছু জনবিরোধী নীতির জন্য তাদের নির্বাচনী ভরাডুবি হয়। কিন্তু ২০১৪ সালে দ্রাবিড়, উৎকল, বঙ্গে পঙ্কজ ফুটেছিল কম। আগামী দিনেও সেই ধারা অব্যাহত থাকবে বলেই মনে হয়।

বিহার নির্বাচনের প্রচারে, বিজেপি হারলে 'পাকিস্তানে বাজি ফাটবে', 'বিজেপি বিরোধীরা পাকিস্তানে চলে যাও' ইত্যাদি আপাতদৃষ্টিতে বালখিল্য কিন্তু ভয়ঙ্কর হুঙ্কার দিয়েছিলেন কেন্দ্রের শাসক দলের নেতারা। বিহারের নির্বাচনী ফলাফলের পরে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি হয়তো সারা দেশে বাজি ফাটার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন। কথায় কথায় প্রতিবেশী দেশকে সামনে রেখে নির্বাচনী বাজি রাখা একটু বড় ঝুঁকি হয়ে গেল না? বিহারে বিজেপির ডাহা হারে এ কথাও প্রমাণিত হল যে, নির্বাচনী রাজনীতিতে রাজনৈতিক অঙ্ক ও ঠিক সময়ে ঠিক নির্বাচনী জোট অতি গুরুত্বপূর্ণ। বিহারের নির্বাচন থেকে শিক্ষা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় প্রধান দুটি বিরোধী দলের মধ্যে নির্বাচনী জোট বা অলিখিত আঁতাঁত হবে কি না, রাজ্যের শাসক দল ২০০৯ লোকসভা নির্বাচন ও ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের মতো আবার কংগ্রেসের পুরানো মাতৃক্রোড়ে ফিরবেন, না ১৯৯৮, ১৯৯৯, ২০০৪ সালের লোকসভা নির্বাচন ও ২০০৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের মতো তৃণমূল-বিজেপি জোট হবে, তা অবশ্য আগামী কয়েক মাসের মধ্যে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

বিহার নির্বাচনের আগে গোমাংস নিয়ে বড় কম বিতর্ক হয়নি। সেই বিতর্কে ইন্দ্রদেব গোমাংস খেতেন বলেও কেউ কেউ সংবাদমাধ্যমে বলেছেন। কিন্তু তাতে কেন্দ্রের শাসক দল ও তাদের মতাদর্শগত অভিভাবকদের কোনও হেলদোল ছিল না। থাকার কথাও নয় হয়তো, কারণ তাঁরা ইন্দ্রদেবের থেকে নরেন্দ্রদেবের উপরে বেশি আস্থা রাখেন। গত লোকসভা ও বিহারের বিধানসভা নির্বাচনে এত দিন নরেন্দ্রদেবের হয়ে গলা ফাটানো এক অর্থনীতিবিদ বিহারের ফল প্রকাশের পরে টিভির পর্দায় বলতে বাধ্য হলেন, 'গরু দুধ দেয়, ভোট দেয় না'। বিজেপি নেতা, কর্মী ও সমর্থকরা কি শুনছেন?

প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক